গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ৭ - ১৩ এপ্রিল ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

ধর্মের নামে দাঙ্গাবাজদের তাণ্ডব

পোশাক দেখেই চেনা যায় অশান্তি কারা পাকাচ্ছে— সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময় বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ৩০ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে অন্তত দু'টি জায়গায় রামনবমীর মিছিলে রিভলবার হাতে নৃত্য করা যুবকদের ছবি দেখেও তিনি কিছু বোঝার চেষ্টা করেছেন কি না, তা দেশবাসীকে জানালে বড় ভাল হত।

বিগত কয়েকটা বছর ধরে রামনবমীর দিনটা এলেই শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের বুক-ঢিপঢিপ শুরু হয়ে যায়— কখন শুরু হবে অশান্তি, আক্রমণ, লুঠপাট, ঘরে-দোকানে আগুন লাগানো, ধর্মস্থান ভাঙা, খুন, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক হানাহানি! দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে রামনবমীর মিছিল থেকে এই বছরও নানা হাঙ্গামা হয়েছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশের একাধিক জায়গায় প্রাণহানি, রক্তপাত, হাঙ্গামা, বাড়িঘর-দোকানে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গও বাদ যায়নি।

বিপুল হুঙ্কারে আক্রমণোদ্যত হনুমানের ছবিওয়ালা পতাকা উড়িয়ে, অস্ত্রের উলঙ্গ আস্ফালন এবং কানফাটানো ডিজের অনুষঙ্গে রামনবমীর মিছিলের যে হিড়িক শুরু হয়েছে, তার সাথে ধর্ম এবং ধর্মাচরণের যোগসূত্র কী থাকতে পারে? কার্যত তা নেইও। ভক্তিপ্রদর্শনই ধর্মের নাম করে মিছিলের উদ্দেশ্য হলে তা বারবার অন্য ধর্মের মানুষের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠার কথা নয়। এমন ঘটনা একটা দুটো বিচ্ছিন্ন জায়গায় ঘটলেও না হয় বলা যেত, এর পিছনে বিশেষ অভিসন্ধি নেই। কিন্তু তা যখন সারা দেশের বহু জায়গার চিত্র হয়ে ওঠে, তাকে নিছক আবেগের বশে ঘটিয়ে ফেলা ঘটনা বলা যায় না। এটা পূর্বপরিকল্পিত এবং সংগঠিত না হলে এমনটা একই সাথে বহু জায়গায় ঘটতে পারত কি? ক্ষমতা

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের হীন চেষ্টা গভীর উদ্বেগের

রামনবমীকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

রামনবমীকে কেন্দ্র করে একের পর এক যে ঘটনা ঘটছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। হাওড়ার পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর রিষড়াতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। কেবল শিবপুর বা রিষড়া নয়, গোটা রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় বিজেপি রামনবমীর নামে মিছিল করে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে যার সবটা

সাতের পাতায় দেখুন

পাঞ্জাবের শিক্ষা কনভেনশনেও বিপুল সাড়া

পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় 'পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে'র কলাভবনে ২৯ মার্চ এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এক মহতী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, চণ্ডীগড় এবং জম্মু-কাশ্মীর থেকে ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়, পাতিয়ালা থেকে ছাত্র এবং গবেষকরাও এতে যোগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে কলা ভবন পর্যন্ত মিছিল হয়। উদ্ধৃতি এবং ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জিএমসি অমৃতসরের পূর্বতন অধ্যাপক এবং অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পাঞ্জাব রাজ্য সভাপতি ডঃ শ্যামসুন্দর দীপ্তি।

কনভেনশনে আগত প্রতিনিধিদের একাংশ

অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও) শুরু থেকেই নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি যে বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ ও বৃত্তিমুখীকরণের পরিকল্পনা, তা তুলে ধরে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি এই শিক্ষানীতি প্রতিরোধে এক কোটি স্বাক্ষর প্রচারাভিযান এবং ২৫ লাখ স্বেচ্ছাসেবক নথিভুক্ত করে ১ লাখ কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল। এতে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় পাতিয়ালায় হল এই কনভেনশন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

ডক ইনস্টিটিউট নির্বাচনে জয় সিপিএম-কংগ্রেস জোটের নয়

২৪ মার্চ হলদিয়া বন্দরের ডক ইন্সটিটিউট নির্বাচনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়ন এলইউডব্লুডব্লু-আইএর প্যানেল এবং বিএমএস অনুমোদিত এইচকেপি এবং ডিএসইউএর প্যানেলকে পরাজিত করে সব কটি আসনে চার-ইউনিয়নের সংগ্রামী জোটের প্যানেল জয়ী হয়। এই জয়কে সংবাদপত্র এবং কিছু টিভি চ্যানেল কংগ্রেস-সিপিএম জোটের জয় এবং তৃণমূলের পরাজয় বলে প্রচার করেছে। যদিও কংগ্রেস বা আইএনটিইউসি-র কোনও অস্তিত্ব বন্দরে নেই।

সাতের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

সমাবেশ

বক্তাঃ- কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

সভাপতিঃ- কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক

শরৎ সদন, হাওড়া, বিকেল ৪ টা

SUCI COMMUNIST

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড প্রবির বসু দ্বারা প্রকাশিত ও প্রচারিত।

দাঙ্গাবাজদের তাণ্ডব

একের পাতার পর

প্রদর্শনের এই রকম মিছিলের সাথে সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণ কিংবা ভক্তির যোগ কিছুমাত্র নেই। এর সাথে একমাত্র যোগ আছে অতি কুৎসিত ধুরন্ধর ভোট রাজনীতির। যে কারণে বিজেপির প্রায় সমস্ত নেতাই রামনবমীর মিছিলকে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অবশ্যপালনীয় অংশ করে ফেলেছেন। বিজেপি শাসিত নানা রাজ্যে দেখা গেছে নিয়ম করে অশান্তি ছড়ানো এবং হাঙ্গামা বাধানোর কাজে বিজেপির এমএলএ, এমপিরা পর্যন্ত নেমে পড়েছেন। একই রকমের ভোট রাজনীতির স্বার্থে বঙ্গীয় তৃণমূল নেতারাও হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার ভয়ে মহা উৎসাহে রামনবমীর হিড়িকে পা মিলিয়েছেন। কংগ্রেস নেতারাও এই রাজনীতিই করে এসেছেন।

সম্প্রতি দেশের ক্রমবর্ধমান ঘৃণা-ভাষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেছেন, ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করার ফলেই অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর ঘটনা মদত পাচ্ছে। রামনবমীকে ঘিরে বারবার যা ঘটছে, সে প্রসঙ্গেও একই কথা অবশ্যই বলা যায়। হাঙ্গামা, অশান্তিতে কোথাও হিন্দুত্ববাদীরা বেশি দায়ী, কোথায় তার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বেশি সক্রিয়। দুটোই নিন্দনীয়। তার থেকে অনেক বেশি নিন্দনীয়— এর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করা একদল ধুরন্ধর রাজনীতিক এবং 'গোদি মিডিয়া' বলে পরিচিত এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাহুঙ্কারে বলেছেন, তিনি নাকি দাঙ্গাবাজদের উল্টো করে ঝোলাবেন। কিন্তু তাঁর দল এবং সহযোগীরাই তো বারবার দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত! তিনি তাদেরও ঝোলাবেন তো?

আসলে তাঁরা সংকীর্ণ স্বার্থে জনগণের মধ্যে চরম সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়াতে সর্বদা সচেষ্ট। তাতে হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

কয়েক বছর আগেও অন্তত বাংলার মাটিতে রামনবমী নিয়ে কোনও হইচই ছিল না। রামায়ণের চরিত্র রাম বাংলার মানুষের ভক্তি অর্জন করলেও রামনবমীর সাথে বাংলার ঐতিহ্য-রীতি-সংস্কৃতির যোগ বিশেষ নেই। বরং এই সময় বহুকাল ধরে বাংলায় পালিত হয়ে এসেছে বাসন্তী পুজোর উৎসব। সাধারণ মানুষের সেই ধর্মাচরণের মধ্যে হুঙ্কারও নেই, অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষও নেই। সেই পশ্চিমবঙ্গেও রামনবমীকে প্রায় দলীয় কর্মসূচিতে পরিণত করে ফেলেছে বিজেপি এবং তাকে ঘিরে অশান্তি ঘটেই চলেছে।

২০১৮-তে আসানসোলে রামনবমীর মিছিলের নামে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা এবং হত্যা এ রাজ্য দেখেছে। একই সাথে দেখেছে ইমাম ইমদাদুল রশিদিকে, যিনি দাঙ্গায় সন্তান হারানোর মর্মবেদনা বুকে চেপে রেখে শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে নানা জায়গায় পরপর কয়েক বছর এই উপলক্ষে অশান্তি, হাঙ্গামা হওয়ার নজির থাকায় রাজ্য প্রশাসন সতর্ক থাকবে এটাই ছিল রাজ্যবাসীর আশা। কিন্তু দেখা গেল এবারেও হাওড়া এবং রিষড়াতে হাঙ্গামা অশান্তি ঘটতে পারল পুলিশের উপস্থিতিতেই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও পুলিশের গাফিলতির কথা প্রথম দিনেই বলেছেন। তিনি কাউকে ছাড়া হবে না বলে হুঙ্কার দিতে পারেন, কিন্তু সারা রাজ্যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জড়ো হচ্ছে এই খবরটাও তাঁর সরকারের পুলিশ রাখতে পারল না কেন এর উত্তর তো তাঁকেই দিতে হবে। রামনবমীকে কেন্দ্র করে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকাকে কার্যত দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল হতে দিয়েছে প্রশাসন। ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতার সাথে শাসকদলগুলির আপস করার মূল্য এভাবেই জনগণকে চোকাতে হচ্ছে।

রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে ওঠা সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এখন জনমানস প্রবল বিক্ষুব্ধ। এর সাথে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ন্যায্য ডিএ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত পদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে তাতেও সরকার চাপে। প্রশ্ন উঠেছে পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই সমস্ত বিষয় থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে দিতেই কি এই হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে ঢিলেমি? এটা কি ঘটতে দেওয়া হল?

পাঞ্জাবের শিক্ষা কনভেনশনেও বিপুল সাড়া

একের পাতার পর

কনভেনশনের প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন রাজ্যের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা বক্তব্য রাখেন। এর মধ্যে রয়েছেন ডঃ শ্যামসুন্দর দীপ্তি, সুরেন্দ্র রঘুবংশী (প্রখ্যাত কবি, মধ্যপ্রদেশ), হুকুম চাঁদ (প্রেসিডেন্ট, মালওয়া জোন, গভর্নমেন্ট কলেজ গেস্ট

কনভেনশনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ফ্যাকাল্টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরস অ্যাসোসিয়েশন, পাঞ্জাব), বল্লী সিং চিমা (বিশিষ্ট কবি, উত্তরাখণ্ড), অধ্যাপক ভীম ইন্দর সিং (চেয়ারম্যান, শহিদ কর্তার সিং সারাভা চেয়ার, পিইউ, পাতিয়ালা), ডাঃ অংশুমান মিত্র (পিপলস হেলথ মুভমেন্টের নেতা ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক), অধ্যাপক বলবিন্দর সিং টিওয়ানা (পিইউটিএ-র পক্ষে) এবং ভি এন রাজশেখর (সর্বভারতীয় সভাপতি, এআইডিএসও) প্রমুখ। অধ্যাপক চমন লাল (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, জেএনইউ) এবং অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লিখিত বার্তা পাঠ করা হয়। বক্তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেন। তাঁরা জনশিক্ষা বাঁচাতে আওয়াজ তোলার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বাম এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। এই অধিবেশনে এআইএসএফ, পিএসইউ, এসএফআই, পিএসইউ-লালকার, পিআরএসইউ, পিএসইউ-শহিদ রনধোয়া, ডিএসও, ডিএএসএফআই, ডিএসএফ সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। এআইডিএসও-র পাঞ্জাব সংগঠনের ইনচার্জ শিবাশিস প্রহরাজ বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের দিল্লি শাখার সম্পাদক শ্রেয়া। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসওর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ।

পাঞ্জাবের আপ সরকার পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপক কর্মচারীরা 'পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও মোর্চা' গঠন করে যে যুক্ত আন্দোলন ও ধর্মঘট চালাচ্ছেন তার প্রতি কনভেনশন থেকে সংহতি জানানো হয় এবং এআইডিএসও ৬ এপ্রিল এই আন্দোলনের সমর্থনে সারা দেশে 'সংহতি দিবস' পালন করার কথা ঘোষণা করে। কনভেনশনের সভাপতি ডঃ শ্যামসুন্দর দীপ্তি প্রকৃত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানান। শিক্ষা ও মানবতাকে বাঁচাতে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিধাননগর লোকালের কর্মী, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক কমরেড লালিয়া দাস (৫৯) ১৪ মার্চ কিডনিতে গুরুতর ইনফেকশন এবং সেপ্টিসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি 'সেভ এডুকেশন কমিটি' ও 'নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দুটি ক্ষেত্রেই আন্দোলন গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যুর

কয়েকদিন আগেও সেভ এডুকেশন কমিটির কর্মসূচিতে যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রাণবন্ত এই মানুষটি, তা দেখে কারও বোঝার উপায় ছিল না, কী কঠিন রোগ তিনি শরীরে বহন করে চলেছেন।

কমরেড লালিয়া দাস ছোটবেলা থেকেই বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ২০১২-১৩ সালের দিকে তিনি এসইউসিআই(সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথমে তিনি দমদম লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে বিধাননগর লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল, স্নেহশীল মনের মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর সন্তানদেরও দলের আদর্শের সংস্পর্শে নিয়ে আসেন। তাঁর স্বামী কমরেড তরুণ দাস যাতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিয়মিত দলের কর্মসূচিতে স্বচ্ছন্দে অংশ নিতে পারেন তার জন্য কমরেড লালিয়া দাসের সদাসতর্ক দৃষ্টি ছিল। সমাজের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ ছিল তাঁর। তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল, আন্তরিক, অমায়িক, উদার চরিত্র কলেজের সহকর্মী থেকে শুরু করে দলের কর্মীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ছিলেন ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা। আংশিক সময়ের অধ্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠার শুরু থেকেই তিনি ছিলেন 'কুটাব' সংগঠনের নেত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সংগঠনের সদস্যদের সবার সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক। সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে আসেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা থেকে শুরু করে তাঁর গুণমুগ্ধরা। কমরেড লালিয়া দাসের মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে। সমাজ হারাল একজন দরদি মনের মানুষকে। ৩০ মার্চ বিধাননগরে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক তরুণ নস্কর।

কমরেড লালিয়া দাস লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড যতীন্দ্রনাথ বর্মন ২১ মার্চ নিজ বাড়িতে বার্ধক্যজনিত রোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৮-তে দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে দলের সংস্পর্শে আসেন। পার্টিকর্মীদের সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বিপ্লবী নিয়মানুবর্তিতায় আকৃষ্ট হয়ে দলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। পরিবারের বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও দলের সমস্ত লড়াই-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে সক্রিয় ভাবে দলের কাজে আরও বেশি মনোনিবেশ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা সন্ত্রাস, ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তিনি দলের একজন হয়েই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড তবিন বর্মন সহ কমরেড সুভাষ বর্মন, কমরেড রাম উরাও, এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক কমরেড সমরেশ ভুঁইমালী, কমরেড ধর্মেন্দ্র সরকার, অর্জুন বর্মন প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড যতীন্দ্রনাথ বর্মনের মৃত্যুতে পার্টি একজন মূল্যবান কমরেডকে হারাল।

কমরেড যতীন্দ্রনাথ বর্মন লাল সেলাম

আপসকামী শক্তিকে পরাস্ত না করে বিপ্লবী আন্দোলন এগোতে পারে না

শিবদাস ঘোষ

‘‘মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন শেড রয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন শেড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বলতে চেয়েছি, তা হল— কংগ্রেস যেমন প্রতিক্রিয়াশীল, স্বতন্ত্রও তেমন প্রতিক্রিয়াশীল, আবার তেমনি চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হল জনসংঘ। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ কথা বোঝা যাবে, কংগ্রেসের চেয়েও জনসংঘ অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। অথচ, অদ্ভুত দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব! আজ পর্যন্ত কোথাও সিপিআই, আর কোথাও কোথাও সিপিআই-সিপিএম, কোথাও কোথাও এসএসপি-পিএসপি আন্দোলনে নেতৃত্ব করছে। কিন্তু তারা এমন ভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজনৈতিক চেতনার মানটিকে গড়ে রেখেছেন যে, সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল বলতে শুধু কংগ্রেসকে মনে করে। আর, অ্যান্টি কংগ্রেসিজমের সঙ্গে এই সমস্ত দলগুলো ও জনসংঘের মিল হয়ে যাওয়ার ফলে এমনকি জনসংঘকেও সাধারণ মানুষ গ্রহণ করছে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের বিকল্প প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে। কিন্তু ভাবছে না, এটা কি বেটার অল্টারনেটিভ? না কি ওয়ার্স্ট অল্টারনেটিভ? বুঝতে হবে, অল্টারনেটিভটা কোন দিকের? তাই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ধারাগুলিকে খানিকটা তুলনামূলক ভাবে দেখালাম।

প্রতিক্রিয়ার এই ধারাগুলির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে বুঝে বা বিশেষ একটা প্যাটার্ন বা ছুৎমার্গতার মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বাস্তবে আমাদের সেই দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হবে। এই উপলব্ধি এমন হবে, যাতে তাদের কন্ট্রাডিকশন এবং কনফ্লিক্টের সুযোগ নিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াকে পর্যুদস্ত করার মধ্য দিয়ে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকেও খতম করে দিতে পারি এবং তার মধ্য দিয়ে প্রগতি ও বিপ্লবের রাস্তা খুলে দিতে পারি। তাই শুধু ভাসাভাসা ভাবে প্রতিক্রিয়া বললে চলবে না। প্রতিক্রিয়ার এই ভ্যারাইটি এবং এর মধ্যে স্তরে স্তরে ভাগ এবং এই পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়াশীল সেটা দেখতে হবে। কখনও অবস্থা বিশেষে চরম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আর একটা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ব্যবহার করার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। এ কথাটা আজই হয়তো বাস্তব নয়। আজ রুলিং পার্টি হিসাবে কংগ্রেস দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দুদিন বাদেই কংগ্রেস রুলিং পার্টি থেকে নেমে এলে এবং জনসংঘ বা ঐ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রুলিং পার্টি হিসাবে অপারেট করতে থাকলে এ হয়তো একটা বাস্তব রাজনীতি হয়ে দেখা দিতে পারে। যদিও সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে, তা যেন সুবিধাবাদের দ্বারা এবং নিছক নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতির কিছু ডিভিডেন্ড পাওয়ার স্বার্থে পরিচালিত না হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবে যে কন্ট্রাডিকশনগুলি রয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করে বিপ্লবীরা যদি এগোতে চায়, কেবলমাত্র মনগড়া তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে না চায়, তা হলে তাদের এই কন্ট্রাডিকশনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। আর, এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে হলে চাই আদর্শের জয়ডঙ্কা অর্থাৎ আন্দোলনের উপর আদর্শগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং জনতার মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক স্থির লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই রাজনৈতিক স্থির লক্ষ্য এবং আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার সামনে আজ প্রধান বাধা হল তারাই, যারা আদর্শকে গুলিয়ে দিচ্ছে, প্রগতির আদর্শকে যারা গুলিয়ে দিচ্ছে, বিপ্লবের কথা বলতে বলতেই যারা বিপ্লব থেকে জনতার মানসিকতাকে অন্য দিকে ডাইভার্ট করে দিচ্ছে— এদেরকেই আমরা বলি, ফোর্সেস অফ কমপ্রোমাইজ বিটুইন লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শক্তি এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তির মধ্যে আপসমুখী শক্তি— যারা মুখে বিপ্লবের কথা বলে, কিন্তু আসলে শ্রমিকশ্রেণি বা বিপ্লবী জনসাধারণের আন্দোলনটাকেই বিভ্রান্ত করে দেয়। খেয়াল রাখতে হবে, তারা কিন্তু প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কাজ করে না, মূলত কাজ করে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে থেকেই। এটাকেই ফোর্সেস অব কমপ্রোমাইজ বলেছেন লেনিন।

মার্কসবাদী আন্দোলনে দেখা গেছে সোসাল ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় যাবার আগে পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কাজ করে না, ক্ষমতায় গিয়েও প্রথম প্রথম করে না। তারপর জনতার কাছ থেকে যত বাতিল হতে থাকে, তত তারা প্রতিক্রিয়ার দিকে যায়। তাদের প্রধান কর্মকাণ্ড হয়ে দাঁড়ায় আপসের মাধ্যমে বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ভাঙন ধরানো। আবারও বলছি, তারা আপসকামী শক্তি হিসাবে কাজ করে। সেইজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে ফোর্সেস অ্যান্ড পার্টিজ অব কমপ্রোমাইজ। এ দেশে সিপিএম এবং সিপিআই এই দুটি পার্টি হল নানা ধরনের সোসাল ডেমোক্রেসির মধ্যে সবচেয়ে সুসংহত পার্টি। এইরকম দুটি দুর্ধর্ষ সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, কমিউনিজমকে মুখোশ বানিয়ে, ফোর্সেস অফ কমপ্রোমাইজ হিসাবে রেভলিউশনারি মুভমেন্টের মধ্যে কাজ করছে। এরা ভিতর থেকে মজুরশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করে এবং তাকে বিপ্লবের পথ থেকে বিভ্রান্ত করে বিপ্লবেরই বুলির আড়ালে। এরাই শোধনবাদী। আগেই এদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তা হলে জনতাকে যদি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের দিকে সংহত অবস্থায় নিয়ে যেতে হয়, তা হলে আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শোধনবাদকে আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে হবে। যদি আমরা তা করতে না পারি, তা হলে শেষ লড়াইতে আমরা জিততে পারব না। অর্থাৎ জনতাকে একটা রাজনৈতিক শক্তিতে আমরা পর্যবসিত করে বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারব না।

এ কথা ঠিক, জনতা সবসময়েই সংগ্রামের শক্তি। কিন্তু সংগ্রাম এসে গেলেই সেই জনতা রাজনৈতিক শক্তিতে আপনাআপনি পর্যবসিত হয় না। জনতা যখন রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তিতে নিজের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তখনই সে পরিণত হয় একটা রাজনৈতিক শক্তিতে। তার আগে পর্যন্ত জনতা রাজনৈতিক শক্তিগুলির দ্বারা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে উলুখাগড়ার মতো ব্যবহৃত হয় এবং নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো তার দ্বারা ফয়দা ওঠায়।

তাই জনসাধারণকে যদি একটা দৃঢ় রাজনৈতিক শক্তিতে পর্যবসিত করতে হয়, তা হলে প্রতি মুহূর্তে শোধনবাদের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ ও নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। শোধনবাদের বিরুদ্ধে আদর্শ ও তত্ত্বগত, কর্মধারা ও কর্মসূচিগত, আন্দোলন পরিচালনার কৌশলগত লড়াই এড়িয়ে গিয়ে আমরা কোনও ভাবেই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতে পারি না। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে যদি আমরা জয়যুক্ত হতে চাই, তা হলে আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শোধনবাদীদের রাজনৈতিক চরিত্র এবং আদর্শগত চরিত্র উদ্ঘাটন না করে আমরা তা কিছুতেই করতে পারি না।’’

‘সোসাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করেই বিপ্লবী দলকে এগোতে হয়’ বই থেকে (১৯৬৯ সালে প্রদত্ত ভাষণ)

বুলডোজার আর মাফিয়া

উত্তরপ্রদেশ সরকারের দুই দোসর

উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার যে কী মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে উঠেছে এখন, কানপুর দেহাত অঞ্চলে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। এই অমানুষিক বর্বরতা ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার নিন্দা করার ভাষা বোধহয় সভ্যসমাজে নেই। বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙতে এসে মা (প্রমীলা দীক্ষিত ৪৫) ও মেয়েকে (নেহা দীক্ষিত ২১) জীবন্ত পুড়িয়ে মারে পুলিশ। সরকারি আধিকারিকদের সামনেই ঘটে এই ভয়াবহ ঘটনা। নিহত মহিলার স্বামী ও ছেলে সহ গ্রামবাসীদের দাবি, সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, রেভিনিউ অফিসার, পুলিশ এবং তাদের দুষ্কর্মের সহযোগী স্থানীয় জমি মাফিয়া বিশাল দীক্ষিত ও তার সাগরেদদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটই বাড়িতে আগুন লাগাবার আদেশ দিয়েছে, পুলিশই আগুন লাগিয়েছে— সংবাদপত্রে এমনটাই উঠে আসছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল, কানপুর দেহাত অঞ্চলের মাদৌলি গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলেছে বুলডোজার। তার সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে একদল উর্দিধারী পুলিশ, পাশাপাশি চলেছে এক জমি মাফিয়া ও তার সাগরেদরা। সাথে কিছু সরকারি আধিকারিকও। এক সময় বুলডোজার এসে থামে কৃষ্ণগোপালের বাড়ির সামনে, সেই সঙ্গে পুরো দল। হাঁকডাকে গৃহকর্তা কৃষ্ণন বাড়ি থেকে বের হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে বলেন যে, তৎক্ষণাৎ পুরো বাড়ি খালি করে দিতে হবে, বাড়ি ভাঙা হবে, এটা ‘গ্রাম সমাজের’ জমি, বে-আইনিভাবে দখল করে বাড়ি করে আছে সে। ছেলে শিবম প্রতিবাদ করে বলে, কয়েক পুরুষ ধরে এ জমিতে তাদের বাস, আগে তাদের ঝুপড়ি ঘর ছিল, পরে পাকা হয়েছে— সে-ও কুড়ি বছর আগের কথা। কেউ কখনও বে-আইনি বলে নালিশ করেনি। গ্রাম সমাজ, স্থানীয় পুলিশ কোনও দিন আপত্তি জানায়নি। সরকার কোনও আগাম নোটিসও দেয়নি। এখন হঠাৎ করে বলা হচ্ছে, তারা বেআইনি দখলদারি, তা কী করে হয়? ‘এ বাড়ি ভাঙতে দেব না’— শিবম বাবা কৃষ্ণনকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢোকে, ঘরের ভিতর থেকে মা ও মেয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। চারজনই বাড়ি থেকে না বেরনোর সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশ জোর করে বাড়িতে ঢুকে তাঁদের উপর চড়াও হয়, শিবমকে মারধর করে, টেনে হিঁচড়ে মা ও মেয়েকে বাড়ির বাইরে বের করতে চায়। না পারায় ক্ষিপ্ত সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ বাড়িতে আগুন লাগাবার আদেশ দেন। পুলিশ কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। ইতিমধ্যেই বুলডোজারও বাড়ি ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে। শিবমের অভিযোগ, পুলিশ পরিবারের সবাইকে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করেছিল। সে কোনও ক্রমে বেরিয়ে আসতে পারলেও মা ও বোনকে বাঁচাতে গিয়ে তার বাবা পুড়ে মারাত্মক আহত হন। পুলিশকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। জীবন্ত পুড়ে মারা যায় মা ও মেয়ে। সরকারি আধিকারিক ও পুলিশের সামনে মা ও মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু— এ তো হত্যাকাণ্ডের সামিল! শিবম ঘটনায় যুক্ত ৩৯ জনকে অভিযুক্ত করে এফআইআর করতে গেলে পুলিশ তা নিতে অস্বীকার করে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে এলাকার শত-শত মানুষ ধরনা-অবস্থান শুরু করলে বাধ্য হয়ে প্রশাসন এফআইআর নেয়। মৈথীর সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ও রেভিনিউ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে দু-জন, এক সরকারি আধিকারিক এবং বুলডোজার চালক।

উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ শুধু নয়, বেশ কিছু রাজ্যে বুলডোজার শাসকের দমনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে সর্বত্র। বুলডোজার দিয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের ঘর-বাড়ি-সম্পত্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এটা দেখে

সাতের পাতায় দেখুন

বিচারপতিদের হুমকি আইনমন্ত্রীর
নিন্দা আইনজীবীদের

কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সুপ্রিম কোর্টের কিছু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে ‘ভারত বিরোধী চক্র’ (অ্যান্টি ইন্ডিয়া গ্যাং) হিসাবে দেগে দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। ১৮ মার্চ মিডিয়া হাউসের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেছেন। তিনি বিচারপতিদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেউই রেহাই পাবে না। দেশের বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে, মূল্য তাদের দিতেই হবে।

আইনমন্ত্রীর এই তালিবানি ফতোয়ার বিরুদ্ধে সারা দেশের ৩২০ জন প্রথিতযশা আইনজীবী সোচ্চার হয়েছেন। এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, আইনমন্ত্রীর মনে রাখা উচিত, সরকার আর দেশ এক নয়। আইনমন্ত্রী সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছেন। আইনমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কর্তব্য বিচারবিভাগ এবং বিচারকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। কিছু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি — যাঁদের বক্তব্যের সাথে তিনি সহমত নন, তাঁদের টার্গেট করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন দুষ্মন্ত দাভে, কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, অরবিন্দ দাতার, ইকবাল চাগলা, রাজু রামচন্দ্রন, সি ইউ সিং, মীনাক্ষি অরোরা, আর ভাইগৈ প্রমুখ।

চিঠিতে আইনজীবীরা বলেছেন, অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিদের হুমকি দিয়ে আইনমন্ত্রী আসলে দেশের প্রতিটি নাগরিককে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন ভিন্নমতাবলম্বীরা ছাড় পাবে না।

মন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আইনজীবীরা বিবৃতিতে আরও বলেন, সরকারের সমালোচনা দেশবিরোধী নয়, দেশাত্মবোধের পরিপন্থীও নয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁরা বলেন, যে সমালোচকরা প্রশাসনের ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা, সংবিধানের লঙ্ঘন ইত্যাদি তুলে ধরেন, তাঁরা মানবাধিকারের মূল নীতিগুলিরই চর্চা করেন। সরকারের সমালোচনা শুধুমাত্র পার্লামেন্ট বা বিধানসভার কক্ষে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না বা কোনও একটা বিশেষ শ্রেণির মধ্যে আটকে থাকতে পারে না।

প্রত্যেকটা নাগরিকেরই অধিকার হল শান্তিপূর্ণভাবে সমালোচনা করা, ভিন্নমত পোষণ করা এবং সরকারের কাজকর্ম নিয়ে নিজস্ব মত ব্যক্ত করা। সরকারের সমালোচনা করলে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অধিকার জন্মায় না তাঁর দেশাত্মবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে দেশবিরোধী হিসাবে দেগে দেওয়ার। আইনজীবীরা মন্ত্রীকে ভলতেয়ারের একটি বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘তুমি যা বল আমি তার সাথে সহমত নই, কিন্তু এ কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য আমি আমৃত্যু লড়ে যাব’।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে
অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দের দাবিতে গণঅনশন

দুই মেদিনীপুর জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে, অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে বর্ষার পূর্বে শিলাবতী নদী এলাকায় খননকাজ শুরুর দাবিতে ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি’র আহ্বানে ২৮ মার্চ সকাল থেকে ঘাটালের কলেজ মোড়ে গণঅনশনে অংশ নেন বহু মানুষ।

অনশনে বসেন কমিটির উপদেষ্টা মধুসূদন মান্না, সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা, কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি, অফিস সম্পাদক কানাই লাল পাখিরা প্রমুখ। দুই জেলার ১৩টি ব্লকের বানভাসি মানুষের ১২৬ জন প্রতিনিধি গণঅনশনে অংশ নেন। সংহতি জানাতে আরও শতাধিক মানুষ বিকেলে অনশনস্থলের সভায় যোগ দেন।

কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজনেরা। ১৫টি গণসংগঠন ও গণফোরামের পদাধিকারীরা অনশন মঞ্চে নেতৃবৃন্দের হাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান ও আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দেন।

পাঁশকুড়ায় বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রাহক বিক্ষোভ

জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্ধ ও খারাপ মিটার অবিলম্বে পরিবর্তন ও অস্বাভাবিক বিল সংশোধন, বাঁশের খুটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দ্রুত সিমেন্টের খুঁটি লাগানো, চাষের মরশুমে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের লাইন না কাটা প্রভৃতি দাবিতে এবং জোরপূর্বক স্মার্ট প্রিপেড মিটার চালুর উদ্যোগের প্রতিবাদে অ্যাবেকার পাঁশকুড়া জোনাল কমিটির উদ্যোগে ২৯ মার্চ পাঁশকুড়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জোনাল কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুধীর মাইতি, কোষাধ্যক্ষ নিলয় খালুয়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা অফিস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ। স্টেশন ম্যানেজার স্মারকলিপি গ্রহণ করে স্থানীয় দাবিগুলি পূরনের আশ্বাস দেন।

উজ্জ্বলা যোজনা নামেই
গরিবের ভরসা সেই কাঠ-কুটো

গ্রামীণ ভারতের ৫১ শতাংশ পরিবার রান্নার গ্যাস ব্যবহার করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গ্রামে ৭৬ শতাংশ পরিবার কাঠকুটো, শুকনো ডালপালা জোগাড় করে মাটির উনুনে রান্না করে। কয়লা, ঘুঁটে বা কেরোসিন কেনার সামর্থ্যও তাদের নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য শহরের হিসাবটা একটু আলাদা। কারণ, শহরে কাঠকুটো, ডালপালা, মাটির উনুন শত খুঁজলেও পাওয়া যায় না। তবুও বহুমূল্য গ্যাসের খরচ বাঁচাতে দিনে একবার রান্না কিংবা চালে একফুট দিয়েই নামিয়ে রেখে আধসেদ্ধ খাবারে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছেন বহু মানুষই। কিন্তু রান্নার গ্যাসের মতো দূষণহীন জ্বালানি যখন আধুনিক জীবনে এসেই গিয়েছে তখন উনুনের কালো ধোঁয়ায় চোখ মুছতে মুছতে কেন রান্না করতে হচ্ছে মহিলাদের?

২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ‘উজ্জ্বলা’ যোজনা চালু করেছিলেন। বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, গরিব ঘরের মহিলাদের বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দিয়ে তাদের দূষণের হাত থেকে রক্ষা করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ঘরে ঘরে মহিলারা ভেবেছিলেন, দুঃখের দিন তা হলে বোধহয় শেষ। কিন্তু গ্যাসের সংযোগ পেয়ে লাভ কী, যদি তা ব্যবহার না করা যায়? উজ্জ্বলা যোজনার সব ‘উজ্জ্বলতা’ ঢাকা পড়ে গেল সিলিন্ডারের দামবৃদ্ধিতে। গ্যাসের দাম বাড়তে শুরু করল হুহু করে। ২০১৪ সালে যে গ্যাসের দাম ছিল ৪১০ টাকা, ২০২৩-এর মার্চে তার দাম হয়েছে ১১২৯ টাকা অর্থাৎ তিন গুণ দাম বেড়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের সময়ে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৯.৬ কোটি পরিবারকে উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে আনা হয়েছে। কিন্তু যারা সংযোগ পেয়েছে, তারা আদৌ গ্যাস ব্যবহার করতে পারছে কি না তা নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। দেখা যাচ্ছে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ওই পরিবারগুলির ১১.৩ শতাংশ মাত্র একবার সিলিন্ডার নিতে পেরেছে এবং ৫৬.৪ শতাংশ পরিবার মাত্র চারটি বা তার কম সিলিন্ডার নিতে পেরেছে। উপরন্তু উজ্জ্বলা যোজনায় ভর্তুকি মাত্র ২০০ টাকা, গ্যাসের দাম ১১২৯ টাকা হওয়ার ফলে ভর্তুকির টাকা বাদ দিয়ে ৯২৯ টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই বহু পরিবারের। আর বেশিরভাগ গ্রাহক যারা ‘উজ্জ্বলা’র অর্ন্তভুক্ত নন, তাদের ক্ষেত্রে সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে মাত্র ১৯.৫৭ পয়সা। তাও সর্বত্র দেয় না। এই ভিক্ষার দানে কারও কোনও সুরাহা হওয়া সম্ভব কি? ফলে এলপিজি সংযোগ থাকলেও কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন অধিকাংশ গ্রাহক।

একদিকে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে চড়চড় করে, পাল্লা দিয়ে রোজগার কমছে মানুষের। তার উপর গ্যাসের দামের এতটা বৃদ্ধি! স্বভাবতই প্রয়োজন থাকলেও গ্যাসের ব্যবহার কমাতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

গ্যাসের দামবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ যখন জেরবার, তখন সমস্যার সমাধানে সরকারের ভূমিকা কী? গত বাজেটে এই খাতে ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল ৪০০০ কোটি টাকা। কিন্তু খরচ করা হয়েছে মাত্র ১৮০ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের মাত্র সাড়ে চার শতাংশ! এই বার বাজেটে ওই ১৮০ কোটি টাকাই বরাদ্দ হয়েছে। গত বছরে নতুন সংযোগ দিতে খরচ হয়েছিল ৮১০০ কোটি টাকা। এ বছর সে খাতে বরাদ্দ মাত্র এক লক্ষ টাকা। বরাদ্দ থেকেই স্পষ্ট, সরকার গ্যাসের সংযোগ দিতেও আগ্রহী নয়। তাহলে রান্নার গ্যাস কি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকা বাস্তবে সম্ভব, নাকি তা মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে?

তেল কোম্পানিগুলির লোকসান আটকাতেই কি গ্যাসের এত দামবৃদ্ধি? বাস্তব তা বলছে না। দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো সংস্থাগুলি মোটা টাকা লাভ করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের মুনাফা ২০২১-’২২-এ ২৪.১৮৪ কোটি টাকা, ভারত পেট্রোলিয়ামের ২০২২-এ শুধু প্রথম ত্রৈমাসিকে লাভ ১৫০১.৬৫ কোটি টাকা, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ২০২১-’২২ অর্থবর্ষে লাভ করেছে ৬ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা। এই বিপুল মুনাফা সত্ত্বেও গ্যাসের দাম আরও না বাড়ালে তাদের ক্ষতি হচ্ছে বলে অজুহাত তুলছে তারা। লজ্জার বালাই না রেখে ‘ক্ষতি’ পূরণ করতে সরকার এদের ২০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়ার ঘোষণা করেছে (ব্লুমবার্গ রিপোর্ট)। একদিকে কোম্পানিগুলির অতি মুনাফা লোটা এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারের ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়াই গ্যাসের এত দামবৃদ্ধির কারণ। ফলে নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি— সাধারণ মানুষের কাছে শহরে-গ্রামে সুলভে গ্যাস পৌঁছে দেওয়া যে কথার কথামাত্র, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উদ্ধত শাসককে মাথা নোয়াতে বাধ্য করল ইজরায়েলের মানুষ

লাগাতার গণআন্দোলনের চাপে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সরকারের মুঠোয় পুরে ফেলার মতলব থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলেন ইজরায়েলের ইহুদিবাদী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিন মাস ধরে চলা দেশজোড়া বিক্ষোভ এবং সর্বাত্মক ধর্মঘটের মুখে পড়ে ২৭ মার্চ নেতানিয়াহু বিচারব্যবস্থা সংস্কারের বিতর্কিত বিলটি স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন। পশ্চিম এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত স্যাঙাৎ ইজরায়েলের ফ্যাসিবাদী শাসক নেতানিয়াহুর এই পরাজয় দেখিয়ে দিল, লক্ষ্যে স্থির থাকলে সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন অতি বড় স্বৈরাচারী শাসকের মাথাও নোয়াতে পারে।

দেশের বিচার বিভাগের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে গোটা ব্যবস্থাটির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। এই উদ্দেশ্যে বিচারব্যবস্থার আমূল সংস্কার ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল তাঁর সরকার। যেমন, বর্তমানে ইজরায়েলের সংসদ বা নেসেটের তৈরি আইন, সরকারি সিদ্ধান্ত ও নিয়োগগুলি যুক্তিসঙ্গত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা বর্তমানে ইজরায়েলের সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে। নেতানিয়াহু তা বাতিল করতে চেয়েছেন। এমনকি বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টিও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতি, বার অ্যাসোসিয়েশন ও নেসেটের দু'জন করে সদস্য এবং দু'জন মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত নয় সদস্যের কমিটি বিচারপতিদের নির্বাচন করে। প্রস্তাবিত সংস্কারে বার অ্যাসোসিয়েশনের দু'জনকে হঠিয়ে সরকারের প্রতিনিধি দু'জনকে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। মানে, নির্বাচন কমিটিতে সরকার তথা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কায়েম করতে চেয়েছেন নেতানিয়াহু। এর বিরুদ্ধেই দেশ জুড়ে ফুঁসে উঠেছে জনরোষ। গণতন্ত্রের উপর এই আঘাত রুখতে পথে নেমেছেন ইজরায়েলের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ঘটনার শুরু জানুয়ারি মাসে। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণপন্থী লিকুড দলের নেতা নেতানিয়াহু ইজরায়েলে সরকার গড়ে প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন। এক মাসের মধ্যেই সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিচারমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন বিচারব্যবস্থা সংস্কারের একটি বিল সংসদে পেশ করেন। বিলের খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। গণতন্ত্র রক্ষায় বিচারবিভাগকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়ার দাবিতে সেই থেকে তিন মাস ধরে তেল আভিভ, জেরুজালেম সহ একশোরও বেশি শহরে লক্ষ লক্ষ আন্দোলনকারী লাগাতার প্রবল বিক্ষোভ দেখান। স্লোগান তোলেন গণতন্ত্র ও বিচারবিভাগের স্বাধীনতার দাবিতে। সংগঠিত, শান্তিপূর্ণ সেই বিক্ষোভে কে না সামিল হয়েছেন! দেশের মহিলা সংগঠনগুলি, বুদ্ধিজীবী ও দেশের শিক্ষিত অংশের মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সৈনিক এমনকি জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়কর্তারা পর্যন্ত দলে দলে বিক্ষোভ মিছিলে সোচ্চার হয়েছেন।

সমস্ত স্বৈর শাসকের মতোই নেতানিয়াহু যথারীতি গায়ের জোরে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা চালান। চলে পুলিশি হামলা। গ্রেপ্তার হন দেড়শোরও বেশি বিক্ষোভকারী। এদিকে বিচার ব্যবস্থা সংস্কারে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্ট। অবিলম্বে এই বিল স্থগিত করার দাবি জানান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন নেতানিয়াহু। এতেই আগুনে ঘি পড়ে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সমর্থনে দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশের পতাকা হাতে ২৫ মার্চ রাতেই রাস্তায় নামেন। পরদিন দেশের প্রধান শহরগুলিতে প্যালেস্তাইনে আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলনকারীরা, যাদের মধ্যে ছিলেন ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাও, বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করেন। জেরুজালেমে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে নেতানিয়াহুর প্রাসাদের সামনে সমবেত হন হাজার হাজার মানুষ। দেশের প্রধান হাইওয়েটি অবরুদ্ধ হয়। ২৭ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দেয় ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন 'হিস্টাড্রুট'। স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। ঝাঁপ ফেলে একমাত্র বিমানবন্দরটিও। দেশে দেশে ইজরায়েলের দূতাবাসগুলির কর্মীরাও সোচ্চার হন প্রতিবাদে। দেশের বাইরে লন্ডনে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে মিছিল হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে বিচার ব্যবস্থার সংস্কার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পর্যন্ত 'গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী' সেজে তাঁকে সতর্ক করে বলেন, এই বিল স্থগিত না করলে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ইজরায়েলের মর্যাদা গোটা বিশ্বের চোখে খাটো হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য হন নেতানিয়াহু। আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত তিনি বিলটি স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন।

কিন্তু কেন বিচারব্যবস্থার উপর এই নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টা? এর পিছনে রয়েছে ইজরায়েলের ইহুদিবাদী উগ্র দক্ষিণপন্থী শাসকদের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা। বহু বছর ধরে ইজরায়েলের রাজনীতি চরম দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। দক্ষিণপন্থী লিকুড পার্টি ছাড়াও সেখানকার নেতানিয়াহু সরকারে রয়েছে ইহুদি ধর্মের সমর্থক অতি গোঁড়া রাজনৈতিক দল, ইহুদি রাষ্ট্রবাদী ধর্মীয় দল এবং উগ্র ইহুদিবাদী কয়েকটি শক্তি। বিচারব্যবস্থাকে মুঠোয় নেওয়ার জন্য সরকারের উপর তারা চাপ সৃষ্টি করছে। কারণ, এই দলগুলির মতে, দেশের বিচারবিভাগে উদারবাদী ও বামপন্থীদের যে প্রভাব রয়েছে, তার ফলে ইজরায়েলের প্রকৃত ইহুদিবাদী পরিচিতি বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে।

এই চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি কারণ। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মাথার উপর ঘুষ, প্রতারণা ও চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মামলা আদালতে ঝুলছে। বিচার ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণে এলে সেগুলি থেকে রেহাই পেতে সুবিধা হবে

সাতের পাতায় দেখুন

আন্দোলনকে ব্লকে ব্লকে ছড়িয়ে দিন

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভায় রাজ্য সম্পাদক

শহিদ মিনারের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, চিকিৎসক, নার্স সহ বিভিন্ন পেশার কর্মচারীদের নিয়ে গড়ে ওঠা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ কলকাতার শহিদ মিনারে একটানা ধর্না চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত কর্মচারীদের জন্য ন্যায্য হারে ডিএ, সরকারি সমস্ত দপ্তরে শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে তাঁদের এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের চোর-ডাকাত বলে যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তার প্রতিবাদে ৩০ মার্চ শহিদ মিনারে যেন জনজোয়ার দেখা যায়। তার আগে মহামিছিলে সামিল হন কর্মচারীরা।

ওই দিন শহিদ মিনারের সমাবেশে মঞ্চের নেতৃবৃন্দের আহ্বানে উপস্থিত হয়েছিলেন, এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণকান্তি নস্কর। অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দও ওই দিন মঞ্চে উপস্থিত হন।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের ভাষণের শুরুতেই শহিদ মিনার ময়দানের বিশাল জমায়েত তাঁর সাথে গলা মিলিয়ে স্লোগান তোলে— এই সংগ্রাম চলছে চলবে। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে এ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি আমরা। ১০ মার্চ অপনাদের ডাকা ধর্মঘট সফল করতে আমরা একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রচার করেছি। কিন্তু এই মঞ্চে আমরা রাজনৈতিক প্রচার করতে আসিনি। গতকাল আন্দোলনকারী শিক্ষক, নার্স, সরকারি কর্মচারী সহ বিশিষ্ট মানুষজনদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার পর আজনা এসে পারলাম না। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা করতে, আর একদিকে আপনাদের যে আন্দোলনকে এতদিন সমর্থন জানিয়ে এসেছি তা আরও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের যে পরিকল্পনা, তার সঙ্গে গলা মেলাতে— আপনাদের মতো আমিও স্লোগান তুললাম।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই শহিদ মিনার ময়দানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিজলি জেলে বন্দিদের হত্যার বিরুদ্ধে মিটিং করেছিলেন। এই পশ্চিমবাংলায় শিক্ষকতার আদর্শ হিসেবে আমরা পেয়েছি বিদ্যাসাগরকে। আজও সমাজে শিক্ষকদের যে শ্রদ্ধা ভালবাসার আসন আছে তাঁদেরও 'চোর' বলে যারা অভিহিত করেন, তাদের কোনও ভাবেই আমরা ক্ষমা করতে পারি না। তাই আমরা গতকালই দাবি তুলেছি এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, সাধারণ মানুষ লড়াই করেই জেতে। অনেকে মনে করেন যেন ভোটের মধ্যে দিয়ে এক দলের বদলে অন্যকে জিতিয়ে দিলেই মানুষ জিতে যায়। না, মানুষ লড়াই করেই জেতে। বিগত দিনে শিক্ষা সহ অন্যান্য দাবিতে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই মানুষ দাবি আদায় করতে পেরেছে। বলুন হ্যাঁ, কি না? বিশাল জনসমাগম সমস্বরে উত্তর দেয়— হ্যাঁ।

তিনি বলেন, লড়াই হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী। আপনারা যত চলেছেন, লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। সরকারের হাতে যতই পুলিশ থাকুক, মানুষ সংগঠিত হলে পুলিশ প্রশাসন পেছনে চলে যায়। দাবি মানতে সরকার বাধ্য হয়। তাই দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্য আপনাদের কাছে আবেদন করব। আপনাদের এই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আজ আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার সকল মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। আপনারা এই মঞ্চকে রক্ষা করুন। এর যে তরঙ্গ তাকে রক্ষা করুন। জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে সংগঠিত শক্তি গড়ে তুলুন, যাতে সরকারের পুলিশ প্রশাসন আন্দোলন ভাঙার কোনও রকম সুযোগ পেতে না পারে। বেকারত্ব দূর করা সহ বিভিন্ন দাবিতে লড়াইকে শক্তিশালী করতে গেলে উপরের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল স্তরে সংগঠিত শক্তি চাই।

শিক্ষক মহাশয়দের এই অপমান— আমাদের দেশের নবজাগরণ, রামমোহন থেকে নজরুল সকল মনীষীর প্রতি অবমাননা। সরকারি কর্মচারী যারা সরকারকে টিকিয়ে রাখে, যারা শিক্ষিত বিদ্বজ্জন, নার্স বা ডাক্তার যারা, আপনাদের সঙ্গে যে সমস্ত মানুষ বা কর্মচারীবৃন্দ যুক্ত হয়েছেন, তাদের অসম্মান করার অধিকার কারও নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এত রাগ কেন? রাগ প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে— তিনি ভয় পেয়েছেন, দুর্বল হয়েছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে মানুষের মধ্যে এক প্রবল বিক্ষোভ।

আবার বলব, বিক্ষোভকে আপনারা দীর্ঘস্থায়ী রূপ যেমন দিচ্ছেন, তেমনি তাকে পাশাপাশি জেলায়, ব্লকে ছড়িয়ে দিন। তবেই সত্যিকারের মর্যাদা রক্ষা পাবে, অন্যায়ের প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের আলো জ্বলে। যারা মনে করেন লড়াই করা, আন্দোলন করা হচ্ছে গণ্ডগোল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

শিক্ষার অধিকার হরণ

সম্প্রতি একজন স্কুল শিক্ষকের মুখে শুনলাম, সরকার ছাত্রের অভাবে ৮ হাজার ২০৭টি সরকারি স্কুল তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নাকি একদম সঠিক। ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয় যখন চলছে না, তখন তা রেখে কী হবে? কিন্তু এ কথাটা ভাবা দরকার, বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কমছে কেন? তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন মানুষ নাকি একটার বেশি দুটো সন্তান নিতে চাইছে না, ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে কমে আসছে। তা ছাড়া সরকার তো সব খরচই চালাচ্ছে। স্কুলের পোশাক দিচ্ছে, লেখাপড়ার জন্য বই দিচ্ছে, খাতা দিচ্ছে, বইয়ের ব্যাগ দিচ্ছে, স্কলারশিপ দিচ্ছে। তা হলে অভাবটা কোথায়?

এ কথা শুনে আমি প্রশ্ন তুলি, কী শিক্ষা দিচ্ছে সরকার? সিলেবাসের অবস্থা কী? অসংখ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদ শূন্য। পড়াবেন কারা? পাশফেল তো সেই কবে থেকেই নেই! স্বভাবতই তিনি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, সরকারি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ভরসা আছে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তিনি আরও বলেছেন আমাদের দেশে কোথাও দারিদ্র নেই। ফলে টাকার অভাবে গরিব ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা শিখতে পারছে না, এটা নাকি ঠিক কথা নয়। সুতরাং তিনি এই সমস্ত সরকারি স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ারই পক্ষে অথবা বেসরকারিকরণের পক্ষে।

একজন সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে তিনি কেন বেসরকারি স্কুলকে সমর্থন করছেন? তারপর বুঝলাম আসলে প্রশ্নটা একজনকে নিয়ে নয়, আমাদের সমাজের একাংশের মানুষ বেসরকারিকরণকে সমর্থন করছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যাঁরা এই বেসরকারিকরণকে সমর্থন করছেন তাঁরা কিন্তু মনেপ্রাণে আবার চাইছেন তার নিজের সরকারি চাকরিটা টিকে থাকুক কিংবা তার ছেলেটা বা মেয়েটা পড়াশোনা শেষে কোনও একটা সরকারি চাকরি পাক। সরকারি স্কুল তুলে দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য স্কুলগুলোতে যখন ছাত্র নেই, শিক্ষক দিয়ে কী হবে! সুতরাং শিক্ষক প্রয়োজন নেই, ওই স্কুলগুলো বন্ধকরে দাও। আর যারা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করতে চায় তাদেরকে সুযোগ দাও। তারা স্কুল তৈরি করুক, শিক্ষা বাজার তৈরি করুক। এটাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে। দেশের পুঁজিপতিরা এটাই চায়। তাদের চিন্তায় প্রভাবিত কোনও কোনও শিক্ষক অধ্যাপকও এমন চান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এর বিরুদ্ধে। সে জন্য ব্যাপারটা অত সোজা নয়। গরিব সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার যে শিক্ষায় সেই শিক্ষার উপর থাবা বসালে ছাত্ররাও ছেড়ে কথা বলবে না। ছাত্র সমাজের সঙঘবদ্ধ শক্তিতে বিক্ষোভ, আন্দোলন, ধর্মঘট যে অভিনব শক্তির জন্ম দেবে তা একদিন এই চিরাচরিত অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে তাদের অধিকার ছিনিয়ে আনবেই।

সুস্মিতা জোয়ারদার
নদিয়া

জঙ্গল মাফিয়াদের জন্যই হাতির হানা বাড়ছে

পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল বলে পরিচিত পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় হাতির আক্রমণ এখন একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই মানুষ এবং গবাদি পশুর জীবনহানি কিংবা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘটনা ঘটে চলেছে। এলাকার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, মাঠে চাষ করা এমনকি রাস্তাঘাটে বেরোতে হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে এক দিনে তিনজনের মৃত্যু, পশ্চিম মেদিনীপুরের সদর ব্লক এবং খড়গপুর গ্রামীণ ব্লকে একই দিনে দুই মহিলার মৃত্যু, শালবনি ব্লকের ভাদুতলাতে একই দিনে গুরুতর আহত হয়ে দুজনের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তির মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। এ বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম জেলায় ৮ জন মারা গেছে, আহত হয়েছে এক শিশুসহ ৪ জন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় জীবনহানি হয়েছে ৩ জনের, আহত ৮ জন। পুরুলিয়াতে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। বাঁকুড়াতে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ঘরবাড়ি ও কৃষি ফসল নষ্টের পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

একই দিনে পরপর মৃত্যু এবং আহত হওয়ার ঘটনায় গ্রামে গ্রামে যেমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, একই সাথে সরকারি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে ২৮ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, নষ্ট ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ এবং জরুরিকালীন পদক্ষেপে হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারি সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টিতে কিছুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া দূরের কথা, উল্টে দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টাই করা হয়েছে। ওই দিনই বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের বক্তব্যেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'হাতির দলের সামনে থেকে জনসাধারণকেই দূরে থাকতে হবে।' তা হলে ঘরবাড়ি চাষবাস নিয়ে মানুষ কোথায় যাবে? বাজারহাটে মানুষ যাবে না? জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল কর্মহীন মানুষের বাঁচার অবলম্বন কেন্দুপাতা, শুকনো ডাল সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়ে তারা বাঁচবে কী ভাবে? এ প্রশ্ন জেলাশাসকের কাছে বোধহয় গুরুত্বহীন। কেউ যাতে না বেরোয় সেজন্য কোথাও কোথাও মাইকে ঘোষণা করে দেওয়াতেই কি সরকারের দায়িত্ব শেষ?

স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের এই ভূমিকায় প্রবল ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। আর এটা লক্ষ করেই সম্প্রতি বেলপাহাড়িতে একই দিনে তিনজনের মৃত্যুর পর বনদপ্তরকে নিয়ে ঝাড়গ্রাম প্রশাসন বৈঠক করেন এবং বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও রাজ্যগত ভাবে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। কিন্তু ফল কী হতে পারে, তা তাঁর বক্তব্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, দক্ষিণবঙ্গের ১৬টি জায়গায় ঘেরাটোপ করে হাতির খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ঝাড়খণ্ড থেকে এমনকি নেপাল, ভুটান থেকে হাতি পাচার করে 'বিমাতৃসুলভ' আচরণ করছে সেখানকার সরকারগুলো। যেন রাজ্যের তাই কোনও দায় নেই! তিনি আরও বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে হাতি দলছুট হয় না, সারিবদ্ধ থাকে। দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গল কেটে দেওয়ায় হাতি দলছুট হয়ে পড়েছে' (আনন্দবাজার,২৬.৩.২৩)। সিপিএম সরকারের আমল থেকে এখনও পর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তায় একদল জঙ্গল মাফিয়া জঙ্গল কেটে লুটে নিচ্ছে। থাকা এবং খাওয়ার ঘোর সংকটে পড়ে হাতির দল গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। পাকা ফসল খাচ্ছে এবং নষ্ট করছে। ঘরবাড়ি ভেঙে খিদের জ্বালা মেটানোর জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বা গবাদিপশু যা সামনে পড়ছে, নিহত বা আহত হচ্ছে। তা হলে এটা তো পরিষ্কার যে, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী হাতি নয়, নিরীহ গ্রামবাসীরাও নন, দায়ী সরকারি মদতে জঙ্গল মাফিয়াচক্র। এই চক্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার? এই চক্রের সঙ্গে নানা মহলের যোগসাজশের কথা এলাকার জনমানসে ওপেন সিক্রেট। কিন্তু প্রাণ যাচ্ছে এবং নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ গ্রামবাসী। অথচ সরকারি মন্ত্রী-আমলারা সবসময়ই দায়ী করেন সাধারণ মানুষকে! কেন তারা জঙ্গলে যাবে, কেন তারা হাতির সামনে ভিড় করবে, ইত্যাদি বলে তাঁরা মূল প্রশ্নটাকেই আড়াল করতে চান।

এলাকার মানুষ জঙ্গল থেকে পাতা তুলে, শুকনো কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করে, আর পিঁপড়ের ডিম, গাছের শেকড় বাকড় খেয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। শাসকরা এদের সংগ্রামের ফলটা নেয়, এদের ভোটটা নেয় কিন্তু মানুষ বলে মনে করে না। আধুনিক সভ্যতার অধিকার থেকে তারা চিরকাল বঞ্চিত করে রেখেছে বনবাসীদের। এখন হাতির কারণ দেখিয়ে জঙ্গলে ঢুকবার ও বেঁচে থাকবার অধিকারটাই কেড়ে নিতে চাইছে। বাস্তবে কর্পোরেটদের হাতে জঙ্গল, পাহাড় তুলে দেওয়ার যে নীতি সরকারগুলির, তারই পথ সুগম করে দিতে চায় এরা। সে জন্যই দেখা গেছে, হাতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রকল্প হিসেবে বামফ্রন্টের আমলে ২০০০ সালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও অবিভক্ত মেদিনীপুরের ৪১৪ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় 'ময়ূর ঝরনা এলিফ্যান্ট রিজার্ভ' করার সিদ্ধান্ত হলেও বামফ্রন্টের ১১ বছর এবং বর্তমানে তৃণমূলের ১২ বছরে কিছুই হয়নি। আজ জরুরি প্রয়োজন, জঙ্গল মাফিয়ারাজ বন্ধ করা, চেকড্যাম তৈরি করা। বনাঞ্চলে উৎপাদিত স্বাভাবিক খাদ্য ও পানীয় হাতি সহ সকল বন্যপ্রাণীর জন্য সংস্থান করা। তবেই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে।

আন্দোলন ব্লকে ব্লকে ছড়িয়ে দিন

পাঁচের পাতার পর

আমরা মনে করি সে কথা মিথ্যে, সে কথা ভুল। সে কথা শাসকেরা বলে। ব্রিটিশ সরকার থেকে পরবর্তী আমলের যারা শাসক, তারা সকলেই এ ভাষাতেই কথা বলে। লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের শক্তি জাগে। মনুষ্যত্বের প্রদীপ জ্বলে। আজকের মাস্টারমশাইরা যে উদাহরণ রেখে গেলেন, তা দেখে ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। সরকার সেই আন্দোলনকে ভাঙতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। আজ সরকার মাস্টারমশাইদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে, কিন্তু তাতে আরও বেশি মানুষ মাস্টারমশাইদের শ্রদ্ধা করছেন।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, আপনাদের সামনে রয়েছে সাতশো দিনেরও বেশি ধর্না চালিয়ে যাওয়া চাকরিতে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েও বঞ্চিত সেই যুবক-যুবতীরা, যাদের বঞ্চিত করে, লুটপাট করে শিক্ষায় দুর্নীতি চলেছে। সরকারের মন্ত্রী বলেছেন, এঁরা তো চাকরি করেন। তাহলে এঁদের আবার ডিএ দেব কেন? সাধারণ মানুষকে দেব। আমি এই প্রশ্ন করতে চাই, সাধারণ মানুষ কি এই তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে কিছু পেয়েছে? মাস্টারমশাইরা পাননি, সরকারি কর্মচারীরা পাননি, চাষি মজুর পাননি। তার সাথে সাথে বলব সাধারণ মানুষও পাননি। সব টাকা চলে গিয়েছে কোথায়? তা আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করছেন।

ভ্রম সংশোধন ঃ ৭৫ বর্ষ ৩৩ সংখ্যায় 'কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে রাজ্য জুড়ে নানা কর্মসূচি' সংবাদে বরানগরের সভায় সভাপতির নাম ভুল ছাপা হয়েছে। ঠিক নামটি হবে কমরেড সাধন চক্রবর্তী। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

পানীয় জলের দাবিতে ডেপুটেশন কোলাঘাটে

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে পানীয় জল প্রকল্পের উপভোক্তাদের পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে ২৪ মার্চ ব্লক জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে পিএইচই (পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং) দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের অভিযোগ, ব্লকের ১৩টি অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় বাসিন্দারা ঠিকমত জল পাচ্ছেন না। ১৫টি রিজার্ভার বসানো হলেও গ্রামের সমস্ত পাড়ায় জলের লাইন পৌঁছয়নি। তিন-চার বছরেই বহু জায়গায় পাইপ ফাটার ফলে জল বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

প্রতিদিন দু'বেলা তিন ঘন্টা করে জল সরবরাহ নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ দ্রুত মেরামতি, ব্লক দপ্তরে একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতি সহ ৬ দফা দাবি তুলে ধরেছে সংগঠন।

বুলডোজার আর মাফিয়া

তিনের পাতার পর

ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের একদল প্রাক্তন বিচারপতি, আইন ও বিচারব্যবস্থার সাথে যুক্ত বিশিষ্টজনেদের একাংশ। গত ১৪ জুন তাঁরা ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে চিঠি লিখে আর্জি জানিয়েছিলেন, আদালতের আদেশ নেই, অথচ বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, এটা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন। আইনের শাসনকে পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া বন্ধ হওয়া দরকার। তা বন্ধ তো হয়নি, বরং বেড়েছে। মার্চে এলাহাবাদে বুলডোজার দিয়ে একাধিক সংখ্যালঘু মানুষের বাড়ি ঘর ও সম্পত্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সুযোগ বুঝে বুলডোজার অভিযানে নেমে পড়েছে বিজেপি মদতপুষ্ট জমি মাফিয়ার দল। তারা নিশানা করছে সেইসব নাগরিকদের যারা বিজেপির অনুগত নয়, সমালোচক বা যার অনেকটা পরিমাণে সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু লোকবল কম বা নেই, কিংবা দামি এলাকায় যাদের পুরনো বাড়ি ও জমি আছে। শাসক দল, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও পুলিশের যোগসাজসে এবং তাদের মদতে জমি মাফিয়ারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মাদৌলি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, জমি মাফিয়া ও তাদের দলবল ওই গ্রামের অনেক জমি গ্রাস করেছে, এখন কৃষ্ণন দীক্ষিতেরটা দখল করতে চাইছে।

১৯৬১ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রয়াত উর্দু কবি এ এন মোল্লা এক ফৌজদারি মামলার পর্যবেক্ষণে সখেদে বলেছিলেন, 'এমন একটি বেআইনি অপরাধী দল এ দেশে নেই, যাদের অপরাধের রেকর্ড, ভারতীয় পুলিশ বাহিনী নামে পরিচিত সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিটির অপরাধের রেকর্ডের ধারেকাছে পৌঁছতে পারে'। সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। বস্তুতপক্ষে, বিজেপি শাসনে পুলিশের আন্দোলন দমনকারী জনবিরোধী ভূমিকা, শাসকদলের দলদাসে পরিণত হওয়ার রীতি এবং সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধী বাহিনী হিসেবে উঠে আসা— এ সবের সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতার পর থেকেই, কংগ্রেস আমলে। এখন মোদি-যোগী তথা বিজেপি শাসনে শত শত পরিবারকে নিঃস্ব করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিনা অপরাধে। মিথ্যা অজুহাতে ধরে পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে যাকে ইচ্ছে তাকেই দেগে হচ্ছে। সাংবাদিক-শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মী সহ সাধারণ মানুষ কেউ বাদ যাচ্ছেন না। অভিযুক্তদের ধরে এনে, বিনা বিচারে এনকাউন্টার করে সরাসরি হত্যা করা পুলিশের কাছে গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে মানে সে 'অপরাধী'। 'অভিযুক্ত' ও 'অপরাধী'-র মধ্যে কোনও ফারাক রাখা হচ্ছে না।

মাদৌলী গ্রামে বুলডোজার অভিযানে মা ও মেয়ের জীবন্ত পুড়ে মরার ঘটনা সামনে এনেছে কতগুলি গুরুতর প্রশ্ন। কৃষ্ণনগোপালের বাড়ি বেআইনি নির্মাণ বলেছেন সরকারি আধিকারিকরা। কথাটা তর্কের খাতিরে সত্য ধরলেও প্রশ্ন, সরকার কি ইচ্ছে করলেই কারও বাড়ি ভাঙতে পারে? ১৯৮৫ সালে মুম্বাইয়ের এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল, বাড়ি বা বাসস্থান বা জীবিকার জন্য যে সম্পত্তি, তা ভাঙতে গেলে সরকার বা কর্তৃপক্ষকে আগাম নোটিস, পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, আর নিতে হবে পুনর্বাসন এর দায়িত্ব— এ ক্ষেত্রে আইনের ওই নির্দেশ মানা হল না কেন? অভিযোগ উঠেছে, যে কেরোসিন দিয়ে বাড়িতে আগুন লাগানো হয়, তা কি পরিকল্পনা মাফিক আগে থেকেই রাখা ছিল? জেলা প্রশাসন ও পুলিশ গোড়া থেকেই বলে আসছে, এটা আত্মহত্যার ঘটনা। জেলাশাসক আগুন লাগানোর কথা মানতে চাননি, তাঁর বক্তব্য মা ও মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে আগুন লাগিয়েছে। তা যদি হয়, সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ চোখের সামনে তা দেখেও তাদের বাঁচানোর কোনও চেষ্টা করল না কেন? গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করেছেন, বাড়ি ভাঙতে আসা সরকারি আধিকারিক ও পুলিশের ওই দলে জমি মাফিয়ারা ছিল কী উদ্দেশ্যে? তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? প্রশাসনের কাছ থেকে কোনও প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায়নি।

দেশে যতটুকু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ রয়েছে, বিজেপি বুলডোজার দিয়ে সেইটুকুও গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থে ও প্রতিহিংসা চরিতার্থতায়, এখন তার পরিধি আরও বিস্তার করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সমাজের অন্যান্য স্তরেও, এমনকি বর্ণবিদ্বেষ ও নানা ধরনের হীন স্বার্থে। এই অবস্থায় আইন-আদালতের বিচারের অপেক্ষায় না থেকে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে— এ ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা নেই।

বাধ্য করল ইজরায়েলের মানুষ

পাঁচের পাতার পর

বলে মনে করছে শাসক দল। ইতিমধ্যেই সংসদে এমন একটি আইন নেতানিয়াহু পাশ করিয়ে নিয়েছেন, যাতে সুপ্রিম কোর্ট 'অনুপযুক্ত' বলে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারবে না। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কা, এই আইন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজে ও তাঁর সরকারে থাকা দক্ষিণপন্থী দলগুলি যে কোনও উপায়ে বিচারব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ এনে খর্ব করতে চাইছে ইজরায়েলে টিকে থাকা গণতন্ত্রের শেষ রেশটুকুও।

শুধু ইজরায়েল নয়। সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছে সংসদীয় বুর্জোয়া ব্যবস্থা আজ যখন অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলছে, তখন দক্ষিণপন্থী শাসকরা বিশ্বের দেশে দেশে গণতন্ত্রের যেটুকু অবশেষ এখনও কোনক্রমে টিকে আছে, তাকে পদদলিত করে শোষণ অবাধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইদানীং ভারতে বিচার ব্যবস্থার আপেক্ষিক স্বাধীনতা যেটুকু এখনও বজায় আছে, কেন্দ্রের দক্ষিণপন্থী মোদি সরকার সেটুকুও হরণ করার এবং প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে নিজের কব্জায় রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ধর্মের নামে দাঙ্গা বাধিয়ে তারা শুধু মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে তাই নয়, গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতি দু'পায়ে মাড়িয়ে, সংসদের বিতর্ক পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়ে, গায়ের জোরে দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে নানা কালা আইন।

কিন্তু ইজরায়েলের মতোই, ভারত সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন উদারবাদী সাধারণ মানুষ দক্ষিণপন্থী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। মানুষ দেখেছে, ভারতের দিল্লি সীমান্তে দীর্ঘ কৃষক আন্দোলন অনেক ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে কীভাবে দাম্ভিক মোদি সরকারকে বাধ্য করেছে সর্বনাশা কৃষি-আইনগুলি বাতিল করতে। এনআরসি, সিএএ-র মতো কালা কানুন জারি করা থেকে উদ্ধত মোদি সরকারকে পিছু হঠতে হয়েছে দেশজোড়া গণআন্দোলনেরই চাপে। ইউরোপ জুড়ে দেশে দেশে আছড়ে পড়ছে গণআন্দোলনের ঢেউ। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি উত্তাল হচ্ছে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সোচ্চার আন্দোলনে। এই সেদিন শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সেখানকার আতঙ্কিত অত্যাচারী শাসকদের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে। সরকারি ভবন, রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল করে নিয়েছে ভুখা মানুষ। যদিও, দুঃখের হলেও সত্য, সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ভুয়ো প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আবার শ্রীলঙ্কায় কায়েম হয়েছে জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্করহিত মালিকি শাসন-শোষণ।

ঠিক এই জায়গায় পৌঁছে আমাদের স্মরণ করতে হবে এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষের সতর্কবার্তা। তিনি দেখিয়েছেন, শাসকের উৎপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বারবার মেহনতি মানুষের চেতনায় ধাক্কা দেয়। বারবার গমকে গমকে ফেটে পড়ে বিক্ষোভ। বারবার পথে নামে অত্যাচারিত খেটে-খাওয়া মানুষ। তারা রক্ত ঝরায়, প্রাণ দেয়। কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব না থাকায় মুক্তি মেলে না। সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে এই অন্যায় শাসন-শোষণ সমাজ থেকে মুছে ফেলা যায় না।

ইজরায়েলে জনসাধারণের এই ঐতিহাসিক জয় দেখিয়ে গেল, ঘৃণ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সে দেশের শাসক শ্রেণি যত বড় উগ্র ইহুদিবাদীই হোক না কেন, শত অপচেষ্টাতেও তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের চেতনা থেকে উদারবাদী সংস্কৃতি, গণতন্ত্রের প্রতি টান, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মুছে দিতে পারেনি। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবল ঢেউ ভেঙে দিয়ে গেছে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরতে চাওয়া দক্ষিণপন্থী শাসকের আধিপত্যবাদী হাতের মুঠো। কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। কারণ, বিচার সংস্কারের বিতর্কিত বিলটি নেতানিয়াহু সরকার আপাতত স্থগিত করেছে মাত্র, বাতিল করেনি। ফলে আগামী দিনে সে যে আবারও দেশের মানুষের উপর এটি চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

এই বিল সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে হবে সঠিক নেতৃত্বের বিষয়টিকে। সেই সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে বিলটি বাতিল করার ও তার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াস এখন থেকেই চালিয়ে যেতে হবে ইজরায়েলের উদারবাদী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে।

জয় সিপিএম-কংগ্রেস জোটের নয়

একের পাতার পর

আসলে হলদিয়া বন্দরে শতাব্দী প্রাচীন একটি ইউনিয়ন— সিপিএসইউ-তে এআইইউটিইউসি'র কর্মী-সমর্থকরা শ্রমিক ঐক্য ও যুক্ত আন্দোলনের স্বার্থে বহু বছর কাজ করছেন। তাঁদের সক্রিয় উদ্যোগে এই নির্বাচনে সিপিএসইউ-র পক্ষ থেকে জোট গড়ার চেষ্টা হয় অন্য তিনটি ইউনিয়নের সাথে। জোটে সিপিএসইউ-র সাথে ছিল কেপিটিপিইইউ, সিপি অ্যান্ড এসএমইউ (সিটু) এবং এইচপি অ্যান্ড ডিইএ (এআইইউটিইউসি)। প্রগতিশীল জোটের এই জয়ের ফলে হলদিয়া বন্দরে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়নের একাধিপত্য ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট নেতৃত্বের ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ধাক্কা খেল। সাথে সাথে শ্রমিকদের সংগ্রামী এই জোট বন্দরে শ্রমিকদের স্বার্থে যুক্ত শ্রমিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে।

অন্যদিকে ইনস্টিটিউটের তথা ক্লাবের কাজকর্মে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয়েও তাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের হীন চেষ্টা

একের পাতার পর

সংবাদমাধ্যমে আসছে না। রামনবমীর জন্য নির্দিষ্ট একটি দিন থাকা সত্ত্বেও এতদিন ধরে এমন মিছিল বিজেপির সুপরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। জনসাধারণের দাবিকে ভিত্তি করে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে গেলে পুলিশকে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে যে কোনও অজুহাতে অনুমতি না-মঞ্জুর করতে দেখা যায়। অথচ জেলায় জেলায় এমন কর্মসূচির পিছনে যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র পরিষ্কার তখন পুলিশ প্রশাসন তা হতে দিচ্ছে, যা পুলিশি নজরদারি ও তৎপরতার অভাবকেই উদ্বেগজনক ভাবে প্রকট করছে। পুলিশের এই ভূমিকা স্বাভাবিক ভাবেই কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে কঠোর ভাবে এই মিছিলগুলি বন্ধ করার দাবি করছি।

৩১ মার্চেই রাজ্য সম্পাদক দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর শুধু পুলিশের সমালোচনা করলেই চলবে না, তাঁকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক রঙ না দেখে সকল দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে হবে। একই সাথে তিনি দাবি করেছিলেন, যাদের প্ররোচনা ও গাফিলতিতে এমন ঘটনা ঘটতে পারল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই দাবিতে দলের হাওড়া টাউন জেলা কমিটি জেলাশাসককে ৩১ মার্চ ডেপুটেশন দেয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

রেলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ

৩১ মার্চ 'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ'-র পক্ষ থেকে ডাঃ তরুণ মণ্ডল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন— পূর্ব রেলের ২৭০টি রেল স্টেশনে ওষুধ, পথ্য, চিকিৎসা সহ অন্যান্য পরিষেবার সুযোগ করে দেওয়ার নামে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ পিপিপি মডেলে বেসরকারি মালিকদের আমন্ত্রণ করছেন যা সামগ্রিক রেল পরিষেবা বেসরকারিকরণেরই অঙ্গ। এতদিনের প্রচলিত রেলের নিজস্ব পরিষেবার বদলে এখন থেকে যাত্রীদের অর্থদণ্ড দিয়ে পরিষেবা কিনতে বাধ্য করা হবে। হকারদের রেলে বা স্টেশনে পরিষেবা কার্যত বন্ধকরার নীতি ঘোষণা করে, রোগী, বয়স্ক নাগরিক, মহিলা, প্রতিবন্ধীদের কনসেশন বন্ধ করে, বহু স্টেশনে ওয়েটিং হল, শৌচালয় প্রভৃতির 'ফি এর বিনিময়ে পরিষেবা' ব্যবসা চালু করে যেমন রেলের বাণিজ্যিকীকরণের পথ সুগম করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও সেরকমই হবে। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং রেলকেই তার নিজস্ব পরিষেবার অঙ্গ হিসেবে বিনামূল্যে যাত্রীদের এই সব পরিষেবা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

প্রায় সব স্টেশনে ডাক্তার ও ওষুধের পরিষেবা এবং চলন্ত ট্রেনেও তার ব্যবস্থা ছিলই, কিন্তু বেসরকারিকরণের ধাক্কায় গত ৩০ বছরে রেল তা প্রায় অবলুপ্ত করে ফেলেছে। এখন আবার টাকার বিনিময়ে সেই পরিষেবা কেনার নিদান দিচ্ছে যা সস্তার রেলের জমিতে মালিকদের মুনাফা করতেই সাহায্য করবে।

স্টেশনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ওষুধের দোকানও মূলত ব্যবসার স্বার্থে, আপদকালীন রোগীর চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয়ের স্বার্থে নয়। তা করতে হলে সর্বক্ষণের ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও এমার্জেন্সি পরিষেবার ব্যবস্থাপনা লাগে যা রেল ক্রমশ কমাচ্ছে বা তুলে দিয়েছে। নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে এই জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে স্টেশনে স্টেশনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে এবং তা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত হবে। এই দাবি সহ অন্যান্য দাবিতে ৫ এপ্রিল কলকাতায় অবস্থান-বিক্ষোভ করে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

নির্মাণ কর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় নাম নথিভুক্তির প্রক্রিয়া সরল করা, সারা বছর কাজ অথবা তার সাপেক্ষে ভাতা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, নির্মাণকর্মী ও তার পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা ও চিকিৎসার দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা নির্মাণকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২২ মার্চ কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে। তিন শতাধিক নির্মাণকর্মী প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সূচনা করেন ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড দীপক দেব। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। তিনি বলেন, নির্মাণকর্মীদের বার্ধক্য জনিত পেনশন ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ সহ সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করতে হবে। বলেন, সারা দেশে বেকার সমস্যা লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেছে। সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সহ কল-কলকারখানায় স্থায়ী কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ। ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও শিক্ষা বঞ্চিত বেকার যুবক এই রাজ্য বা অন্য রাজ্যে নির্মাণকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই শ্রমিকদের উপর চলছে নির্মম শোষণ ও বঞ্চনা। এর বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে। এই বিক্ষোভগুলিকে শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা ও এআইইউটিইউসি-র প্রয়াত সভাপতি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। ধনী গরিবে বিভাজিত এই সমাজে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির লক্ষ্যে নির্মাণকর্মীদের আন্দোলন পরিচালিত করা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রেণিচেতনা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

কমরেড শান্তি ঘোষকে সভাপতি ও কমরেড পূর্ণচন্দ্র বেরাকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

পরিচারিকা সমিতির ডেপুটেশন

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির বাঁকুড়া শাখার পক্ষ থেকে ২৩ মার্চ শহিদ ভগৎ সিং এর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ওই দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে রেশনে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া, খাবার অযোগ্য আটার প্যাকেট দেওয়া, নানা অজুহাতে সরকারি স্কুল বন্ধকরে দেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল করে এসডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়াও সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় পরিচারিকাদের প্রাপ্য টাকা মেটানো, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা, ৬০ বছর বয়স হলে পরিচারিকাদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া, সপ্তাহে একদিন ছুটি দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার সহ পাঁচ জন পরিচারিকা। আলোচনার ভিত্তিতে এসডিও দাবিগুলি মেনে নেন এবং পরিচারিকাদের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার টাকা ও বার্ধক্য ভাতা নিশ্চিত করা, মদ-সাট্টা-জুয়া বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার প্রত্যন্ত গ্রাম নেৎকামলায় দেওয়াল লিখনে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি

জেলায় জেলায় ছাত্র সম্মেলন

কোচবিহার ঃ রাজ্যে ৮২০৭ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল, তিন বছরের পরিবর্তে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে কোচবিহার শহরের সাহিত্য সভা হলে ৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় একাদশ কোচবিহার জেলা ছাত্র সম্মেলন। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার এবং এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড বিশ্বরঞ্জন গিরি, কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড জহিদুল হক। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন কুমার বর্মন। সম্মেলনে কৃষ্ণ বসাককে সভাপতি, বৈশাখী নন্দী ও শিবু রায়কে সহ সভাপতি, আসিফ আলমকে সম্পাদক ও রূপালী সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৬ জনের জেলা কমিটি ও ৪৬ জনের জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

জলপাইগুড়ি ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল সহ নানা দাবিতে ১ এপ্রিল জলপাইগুড়ি শহরের স্টুডেন্টস হেলথ হোমে অনুষ্ঠিত হয় দশম জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র সম্মেলন। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ এবং এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড বিকাশরঞ্জন কুমার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কল্লোল বাগচী। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি কমরেড ধনঞ্জয় রায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড বিশ্বরঞ্জন গিরি। শ্যামল দাসকে সভাপতি, ধীমান রায়কে সহ সভাপতি, কুণাল রায়কে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ জন সদস্যর জেলা কমিটি ও ৪১ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে ছাত্রশিবির পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com